

Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবুল হাসান : জীবনবোধ ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.6
Pages	117-136
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবুল হাসান ঃ জীবনবোধ ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য

বিশ্বজিৎ ঘোষ

আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, স্মৃতিমুগ্ধতা, আত্মমুখিতা এবং হার্দিক-রক্তক্ষরণের রূপকার হিসেবে বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যে কবি আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) একটি বিশিষ্ট নাম। ষাটের দশকের মধ্যলগ্নে বাংলা কাব্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন একটি স্বকীয় কাব্যভুবন। আত্মতা এবং আমিত্বই আবুল হাসানের সহিত্যকর্মের মুখ্য উপজীব্য; বস্তুত, তাঁর প্রায় সকল সৃষ্টিই আত্মজৈবনিক রচনা। আত্মপ্রীতি, দুঃখবোধ আর স্বপ্নপীড়িত বেদনাবিলাস নিয়ে আবুল হাসান ডুবে থাকতে চেয়েছেন তাঁর অন্তস্তলে; কিন্তু সংবেদনশীল শিল্পীসত্তা তাঁকে অন্তর্লোকের অতল থেকে বার বার তুলে এনেছে বহির্লোকের প্রাঙ্গণে। তাই বিরূপ-বিশ্বে নিয়ত একাকী হয়েও তিনি অবশেষে মারী আর মড়ক, প্রণয় আর প্রতারণা, রিক্ততা আর রুগ্নতা অতিক্রম করে জয়শ্রী-জীবনের সন্ধানে উপস্থিত হন সমষ্টির আঙিনায়। আত্মভাষ্যের আড়ালে আবুল হাসানের কবিতা-গল্প-নাটকে আমরা লক্ষ্য করি সমকালীন বাংলাদেশের নানা আলোড়ন-বিলোড়ন, মূল্যবোধহীনতা, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার, সংগ্রামশীল মানুষের দুর্মর জীবনযন্ত্রণা, স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি এবং যুদ্ধোত্তর বিপন্নতার চিত্র। তবে, কবি আবুল হাসানের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, নিখিল নিরাশার প্রান্তরে বাস করেও তিনি মানুষকে শোনান আশার গান, তাঁর সৃষ্টিসত্তার হয়ে ওঠে 'অনিঃশেষ শান্তিকামী আলো'-র অপরূপ-উৎস।

আবুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা-অন্তর্গত টুঙ্গীপাড়া থানার বর্নি গ্রামে, তাঁর মাতুলালয়ে। এই বর্নি গ্রামেই অতিক্রান্ত হয়েছে

তাঁর শৈশব-কৈশোরের বর্ণ-রঙিন দিনগুলো। মাতুলালয়ে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ, ছেলেবেলা থেকেই হাসানকে সাহিত্যসাধনা ও গ্রন্থ-অধ্যয়নে আগ্রহী ও উৎসাহী করে তোলে। যৌবনে পদার্পণের পূর্বেই আবুল হাসান তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের ব্যক্তিগত পাঠাগারে বসে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবির রচনা পাঠ করেছেন। উত্তরজীবনে কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি আবুল হাসানের অনুরাগের সূত্র এখানেই নিহিত। কৈশোরে একাধিকবার তিনি পাঠ করেছেন মীর মশাররফ হোসেনের *'বিষাদ-সিন্ধু'* উপন্যাস। আবুল হাসানের মানসলোকে প্রতিস্বিক চেতনা-সংগঠনে মামা বাড়ির এই অনুকূল প্রতিবেশ পালন করেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।[১] পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা এবং গল্পে যে-সংগ্রামশীল গ্রামীণ মানুষের প্রতিরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার প্রাথমিক প্রেরণা-উৎস বর্নি গ্রাম আর তার সংগ্রামী জনগোষ্ঠী। শৈশবের বর্নি গ্রাম আবুল হাসানের চিত্ততলে রোপণ করেছে ভালোবাসার বীজ; বর্নির অবারিত প্রকৃতি উত্তরকালে তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল ভরা-নদীসম 'আবেগের প্রতিনিধি'। আবুল হাসানের বর্নি গ্রাম যেন *'পথের পাঁচালী'* উপন্যাসের অপুর নিশ্চিন্দিপুর। আবুল হাসানের কবিতায় শৈশবের বর্নি গ্রাম আর তার জনগোষ্ঠী স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে:

> কি রকম পাহাড়িয়া গানে আর হারানো পাখির প্রার্থনায়
> ফুরিয়ে গিয়েছে শৈশব সুরভিত বকুল বাগান ফুরিয়ে গিয়েছে সেই
> হাটুরে নৌকার গভীর রাত্রির চোখে চোখ ফেলা বিস্মিত বালক।
>
> .. তাই কেন যেন
> হয়ে যাই আজো সেই বর্নির বাওড়ের বৈকালিক সূর্যাস্তের পথ।
> যেখানে নদীর ভরা কান্না শোনা যেত মাঝে মাঝে
> জনপদবালাদের স্ফুরিত সিনানের অন্তর্লীন শব্দে মধুর।
>
> মনে পড়ে সরজু দিদির কপালের লক্ষ্মী চাঁদ
> মনে পড়ে তার নরোম যুঁইয়ের গন্ধ লেগে থাকা চোখ;
> চোখের চলিত ভাষা।
> সারারাত হলি কীর্তনের সে কী নদীভূত বোল![২]

শৈশবের বর্নি গ্রাম আবুল হাসানের মানসলোকে সঞ্চার করেছে যেমন-আবেগের বেগ, তেমনি উপ্ত করেছে মানবিকতার বীজ। বর্নি গ্রামের হিন্দু মুসলমানের মিলিত জীবনস্রোতে অবগাহন করেছেন আবুল হাসান। একই পাড়ায় পাশাপাশি ঘরে দুই সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হাসানের চেতনায় শৈশবেই সঞ্চার করেছে

অসাম্প্রদায়িকতার ভ্রূণকোষ। শৈশব-কৈশোরে তিনি রাত জেগে হরি-কীর্তন আর মহাভারতের পালাগান শুনতেন। উপর্যুক্ত কবিতাংশে আমরা বর্নি গ্রামে তাঁর শৈশবকালীন এই অনুরাগের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করি। উত্তরকালে আবুল হাসানের এই অসাম্প্রদায়িক-চেতনা দিন দিন প্রগাঢ় হয়েছে, প্রতীতিতে হয়েছে দৃঢ়মূল।

কেবল অসাম্প্রদায়িকতা নয়, বর্নি আর তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম টুঙ্গীপাড়া শৈশবেই হাসানের অন্তরে জ্বেলে দিয়েছে জাতীয়তাবাদের বীজ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের প্রচার-অভিযান, টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হাসানকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বয়স তখন মাত্র সাত বছর। কিন্তু ওই অল্প বয়সেই সংবেদনশীল হাসান ভালোবেসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরবর্তীকালে, ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু তাঁকে করেছিল ব্যথিত, মর্মমূলে আহত। এ-প্রসঙ্গে তাঁর সামসময়িক কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের স্মৃতিচারণ স্মরণীয় :

> আবুল হাসানের মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে--সেই নিনাদিত দুঃখের বছর, বাঙলী জাতি যা বিবিধ কারণে কখনো বিস্মৃত হতে পারবে না। মনে আছে,আগস্টের রক্তাক্ত রজনীর পর একদিন তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছিল রিকশায় যেতে যেতে। তিনি তাঁর নিয়তি-দত্ত অসুস্থতার সাথে শেষ যুদ্ধে লিপ্ত তখন; বার্লিন থেকে ফিরেছেন, অনেকটা হতাশ ও দার্শনিক। মুজিবের মৃত্যু তাঁকে আহত করেছিল গভীরে, ভেতরে। বাইরে তার সেই প্রবাদ প্রতিম নির্লিপ্তি ও বিষন্নতা, কিন্তু ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ কাজ করছিল, বুঝতে পারছিলাম। 'দেশে তো বিপ্লব ঘটে গেলো'-আমার এহেন পরীক্ষামূলক এবং অচিন্তিত মন্তব্যের জবাবে ফুঁসে উঠেছিলেন হাসান; স্বভাবসুলভ একটি অমুদ্রণযোগ্য বাক্যাংশ উচ্চারণের পর বলেছিলেন, 'বিপ্লব কোথায় দেখলেন, এতো সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ লীলালাস্য।' তারপর আউড়ে ছিলেন, মৃত জনক সম্পর্কে হ্যামলেটের উক্তি, বঙ্গপিতার প্রসঙ্গে, He was a man, take him for all in all, I shall not look upon his like again." [৩]

দেশের প্রথাচল রাজনীতির প্রতি আবুল হাসান ছিলেন উদাসীন, কিন্তু তাই বলে রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে করেন নি কখনো বিচ্ছিন্ন। বাইরে নির্লিপ্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে তিনি সচেতনভাবেই রাজনীতির ধারা পর্যবেক্ষণ করতেন। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের উপর্যুক্ত স্মৃতিচারণাই আবুল হাসানের

রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয় বহন করছে। এ-প্রসঙ্গে 'গণকণ্ঠ', 'জনপদ' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় আবুল হাসানের উপ-সম্পাদকীয় কলামগুলি পড়লে সহজেই বোঝা যাবে তাঁর রাজনতি-সচেতনতা ছিল কত প্রখর। ওই সব উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে আবুল হাসান সচেতন রাজনীতিকের মতো বিশ্লেষণ করেছেন সামসময়িক বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনাচার, মূল্যবোধের বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং মননের বিপন্নতা। তবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আবুল হাসান নিজেকে কখনো জড়াতে চাননি, কিম্বা বলা যায়, জীবনের ওই অনিবার্য দিকটা বরাবর রহস্যজনকভাবে তিনি এড়িয়ে গেছেন। এ- প্রসঙ্গে আবুল হাসানের নিজস্ব অভিমত স্মরণীয়ঃ

> আমি কোনদিন ইচ্ছে করেই রাজনীতির রাজপথী হইনি। চিরকাল প্রজার বিদ্রোহ দেখে দেখে রাজপথী হওয়াটা আমার ধাতেও সয়নি। আমি তবু হুমায়ুনের (কবি হুমায়ুন কবির) একজন সার্বক্ষণিক দর্শক ছিলাম বলতে গেলে। কেননা একসঙ্গেই এসেছিলাম ঢাকায়।' বরিশালের যে যে জায়গাগুলো ওর পছন্দ ছিল, সে-জায়গাগুলি আমিও ভালোবাসতাম।[৪]

আবুল হাসানের জীবনবোধ ও শিল্পীসত্তার মৌল পরিচয় তাঁর প্রবাদপ্রতিম আমিত্ব, আত্মতা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিহিত। ষাটের দশকের কবি হয়েও আবুল হাসানের মধ্যে সর্বদা লক্ষ্য করা গেছে এক ধরনের বাউল কিংবা বৈষ্ণবীয় নির্লিপ্তি আর ঔদাসীন্য। ষাটের উত্তাল কল্লোলের মধ্যে বাস করেও তিনি অনায়াসে রাজনীতির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে কবিতার ভুবনে রোপণ করেন আপন আত্মার বীজ। আবুল হাসানের রচনায় রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ নেই, কিন্তু কবিতা-গল্প-নাটকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিলেই ধরা পড়বে তাঁর রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয়। জীবনবিলাসী ও সমাজসতর্ক আবুল হাসান ইতিবাচক জীবনার্থের শিল্পিত ছোঁয়ায় সমস্ত জ্বরা-ক্লান্তি-দুঃখ-বেদনা-মৃত্যু অতিক্রম করে পৃথিবীর বুকে ফোটাতে চেয়েছেন 'জয়শ্রী জীবনের' বর্ণিল শতদল।

শৈশব-কৈশোরের স্বতন্ত্র মানস-সংগঠন, ঢাকায় বোহেমীয় উড়নচণ্ডী জীবন, পরিবারবিচ্ছিন্ন উন্মূলিত যাপিত-যৌবন আবুল হাসানের চেতনায় জন্ম দিয়েছে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা। একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণার শিল্পভাষ্যই আবুল হাসানের কবিতা। তাঁর বহু কবিতা ও গল্পে এবং 'পরিস্থিতি' শীর্ষক অপ্রকাশিত নাটকে এই একাকিত্বের বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে। 'বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকী'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো আবুল হাসানও একাকিত্বের বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়ে ঘোষণা করেন:

> অবশেষে জেনেছি মানুষ একা।
> জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!
> দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে
> কোনদিন![৫]

আত্মগত ভাবনার শিল্পপ্রতিমা নির্মাণই ছিল আবুল হাসানের মৌল-অন্বিষ্ট। ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্গত রক্তক্ষরণ হাসানের কবিতায় অপরূপ-ভাষ্যে উন্মোচিত হয়েছে। শেষের দিকে আবুল হাসান আত্মতার আবরণ ছিঁড়ে কখনো কখনো সমষ্টির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে চেয়েছেন-- জীবনবিলাসী বৃক্ষের মতো চারদিকে মেলে দিতে চেয়েছেন তাঁর শিল্পের ডাল-পালা। স্বদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অমানবিকতা, মারী-মড়ক-দুর্ভিক্ষ, দুঃশাসন--ইত্যাদি সবকিছুই হাসানের কবিতায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। তবে, শিল্পদৃষ্টির প্রশ্নে, এ-প্রসঙ্গে কখনো কখনো তিনি দ্বিধাগ্রস্ততায় ভুগেছেন। দৈনিক 'জনপদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আপন 'ছায়া' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় কলামে (৪.২.১৯৭৩) তাঁর এই দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়:

> ব্যাংক নোটের মতো মূল্যবান মনে হচ্ছে এখন আমার সেই সব কবিতা, যা আমি ফেলে দিয়েছি। ঐ সব কবিতায় আমি আমার স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ প্রকাশ দিতে পেরেছিলাম। এখন যতই আধুনিক মানুষের কাছাকাছি আমার জীবন-যাপন অতিবাহিত হচ্ছে ততই আমার শব্দাবলী আমার শিল্পদক্ষতার কৃত্রিমতা নিয়ে আরো কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। এখন আমাকে একুশে ফেব্রুয়ারীর কবিতাকেও একুশে ফেব্রুয়ারীর কবিতা না কোরে সরল গরল, একটা কিছু 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরনের নিরপেক্ষ কবিতা লিখে দিতে হয়। এখন গোলাপের ভিতর অন্য কোনো গোলাপ আছে কিনা তার সন্ধান খোঁজার একটা বাতুল পাণ্ডিত্য আমাকে তথাকথিত শিল্পবিচারকদের সহযাত্রী করেছে। আমি এখন শিশির লিখতে গেলে 'বড় বেশী কাব্যিক' এই শব্দটা যেনো পিছন থেকে শুনে ফেলি আর বাধ্য হয়েই অকস্মাৎ ঐ শব্দটি আমাকে বর্জন করতে হয়।...
>
> ভীষণ দোটানায় পড়ে গেছি। কবিতা সম্পর্কে এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে কারো ভালোলাগে নাকি? নিতান্ত ডাল-ভাত খাওয়া একজন বাঙালী যুবার হৃদয়ের ভিতর ভালোবাসা আছে-অথচ সেই ভালোবাসা এখন ওদের ভাষায় এমনভাবে লিখতে হবে যেনো

> দিকে চাইতে পারিনা। আমার চোখে জল আসে যখন আমি একটা ভিখারীকে অসহায় অবস্থায় হাত পেতে ভিক্ষা করতে দেখি--কিন্তু ঐ সরল জল প্রকাশের ব্যাপারটাই নাকি শিল্পের আধুনিক আপত্তি। অবশ্য শিল্পের আপত্তি আছে কিনা জানিনা তবে এক ধরনের কাব্যবিচারকের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়--তারা কবিত্ব থেকে শুরু কোরে সামাজিক সকল সমস্যার একটি আধুনিকীকরণ চান--যা কোরতে গিয়ে এখন আমার শিব গড়তে বাঁদরের অবস্থা। আমি এখন আমার সত্যি শব্দগুলি কবিতায় লিখতে পারছিনা। ফলে কবিতাই লেখা হচ্ছেনা আর। আমার মনে হয় আমি ভীষণ ভুল করেছি--আমি যে-রকমভাবে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, ওই রকমই আমার লেখা উচিত ছিল।

'রাজা যায় রাজা আসে' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলো কবিতা নস্টালজিয়া আক্রান্ত-ওইসব কবিতায় ধরা পড়েছে অতীতের সোনালি দিনগুলো পাবার জন্যে আবুল হাসানের অন্তর-আকুতি। শৈশবের বন্ধু হেলাল, কাঞ্চন, ওয়ালী, বাচ্চু ও রাব্বীকে উৎসর্গিত ''স্মৃতিকথা'' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে নগরসন্ন্যাসী আবুল হাসানের স্মৃতিভারাক্রান্ত মনের পরিচয়--''যে বন্ধুরা কৈশোরে নারকেল বনের পাশে বসে/ আত্মহত্যার মতো বিষন্ন উপায়ে উষ্ণ মেয়েদের গল্প কোরতো/ শীতকালে চাঁদের মতোন গোল বোতামের কোট পরে/ ঘুরতো পাড়ায়,/ যে বন্ধুরা থিয়েটারে পার্ট কোরতো,/ কেউ সাজতো মীরজাফর, কেউবা সিরাজ/ তারা আজ, এখন কোথায়?[৭] কখনো-বা স্মৃতির স্মরণী ধরে শৈশবের মা এসে উপস্থিত হন, তাঁর কবিতায়:

> মনে পড়ে যায় খালি ঘড়াটার পার্শ্বে
> চোখে ডুব দিয়ে মা আছেন দাঁড়িয়েই
> অনাহার যার কাঁধে বুলাচ্ছে সেই কোন্
> প্রপিতামহীর হৃষ্টপুষ্ট করতল![৮]

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *'যে তুমি হরণ করো'*-তে আবুল হাসানের উচ্চারণ অনেক বেশী অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ এবং গভীর উপলব্ধি-জাত। এই কাব্যগ্রন্থে স্বাধীনতা-উত্তর বিপন্নতার চিত্র আছে, দুঃসহ জীবন থেকে পলায়নের প্রসঙ্গ আছে, আছে নস্টালজিয়া-আক্রান্ত অন্তর্বেদনার কথা--কিন্তু একই সঙ্গে, এ-কাব্যেই প্রস্ফুটিত হয়েছে আবুল হাসানের ইতিবাচক জীবনদৃষ্টির শিল্পকুসুম। সহস্র মারী আর বন্যা, অসুখ আর মরণ উপেক্ষা করে মাটি আকঁড়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে জীবনবিলাসী মানুষ, সেই মানুষের জয়গাথাই *'যে তুমি হরণ করো'* কাব্যের কেন্দ্রীয় অন্বিষ্ট। আত্মহতা

আর আমিত্বের সাথে সাথে এ-কাব্য থেকেই তিনি হয়ে উঠেছেন মাটি আর মানুষের অভিসারী--

লিখতে লিখতে ফিরে তাকাই মাটির দিকে, তাকাই ফিরে, মাটি মাটি মাড়াই মাটি
সঙ্গে সঙ্গে সুদৃষ্টিপাত, হিম অনাদি, হা হৃদপিণ্ড, হা হৃৎকমল শিল্পবেদী,
যূথচারী মানুষ আবার মানুষ গড়ে লোকলস্কর মহৎ আঁধার, অন্য আঁধার অভিজ্ঞতা,
... ...
লিখতে লিখতে তাকাই ফিরে মাটির দিকে, মাটি মাটি মাড়াই মাটি
সাধ্যমতোন যেমন পারি মাটিতে যাই শস্যপর্ব, শস্যমুগ্ধ শস্যমানুষ। [৯]

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক'-এ আবুল হাসানের এই ইতিবাচক জীবনার্থ হয়েছে অনেক বেশী প্রগাঢ় এবং দার্শনিকতা-ঋদ্ধ। আবুল হাসান শেষের দিকে উপনিষদে নিমগ্ন হয়েছিলেন। আলোচ্য কাব্যে আমরা লক্ষ্য করবো উপনিষদ-আহৃত বাণীই যেন তাঁর কবিতায় শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। এখানে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষকে শোনান শান্তির পরমার্থ সঙ্গীত:

বলো তারে শান্তি শান্তি হিরন্ময় পাত্রে ঢাকা বীজধান,
জলবাঁশি, সুস্বাদু রাখাল,
সূর্যতপা মাটির গভীরে গাঢ় গায়কী আখড়াই গ্রাম,
আকাশে আড়ালে নীলিমা :
... ...
তবু বল্, আছে
সব গিয়ে সব থুয়ে এখনো চুম্বনেচিতে
স্পর্শে হর্ষে শীতে আলিঙ্গনে শিল্পের শোভায়
কেউবা সফেন শান্ত চুপিসারে মানবিক লোক
মধ্যরাতে ঝাউকান্না কেঁদে বলে, শান্তি হোক, ওরে শান্তি হোক![১০]

এই শান্তির অন্বেষায় তিনি রোগশয্যায় শুয়ে থেকেও সুদূর বার্লিন থেকে দেশবাসীর জন্য পাঠিয়ে দেন কল্যাণের কবিতা। মঙ্গল আর আনন্দের অবধূত আবুল হাসান মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও গেয়েছেন মরণবিজয়ী গান--জীবনবিলাসী বৃক্ষের মতো তিনি সর্বদা তাকিয়েছেন সূর্যের দিকে। তাই আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনেও জীবনের জন্য তিনি মানুষকে শোনান ক্ষমতা আর মনীষার কথা-"তৈরী থেকো, হে উত্তমা হে বোধি পরমা/ ছিপখান, তিনদাঁড় তোমাকে পাঠাই যেন তরী!/ স্বাস্থ্যনিবাসের নীলে আমার উদ্ধার ঐ সুন্দরী কিশোরী/ এ বয়সে এখনি সেবিকা!/ জানে মমতায় কত মন্বন্তর মুছে দেওয়া যায়!/ জানে মমতায় কত জন্ম নেয় মনীষা, মনীষা!" [১১]

জীবনের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা-রক্তক্ষরণ আর নিঃসঙ্গতাকে ধারণ করে আবুল হাসান ধূর্জটির মতো বেদনায় নীলকণ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি আত্মরতির পঙ্কে নিজেকে নিমজ্জিত করেননি--বরং 'গলগণ্ডে ধুতুরার বিষ' ধারণ করে তিনি পৃথিবীর মানুষকে দিতে চেয়েছেন অমৃতের শিল্প-আস্বাদ। একটি অসাধারণ কবিতায় তিনি লিখেছেন--''ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও/ ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও!''[১২] তিনিও বিষের বালি বুকে-নেয়া ঝিনুকের মতো, নীলকণ্ঠ ধূর্জটির মতো পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা একাকী নীরবে ধারণ করেও মানুষকে শোনান এই পরম আশ্বাসবাণী, জয়তু জীবনের এই বন্দনা-গীত :

গলাজল পেরিয়ে এসেছি--মানে জীবনের সকল সন্দেহ :
এখন অন্যেরা কার করুণার ভিক্ষা চায়--যাবো
তাদের গলায় দেবো আমার আরাধ্য মালা, সকলের ভালো।

আমাকে গ্রহণ করতে হবে সব মানুষের উত্থান পতন,
জয় পরাজয় বোধ, পিছু ফেরা সামনে তাকানো--

আমার অনলে আজ জাগো তবে হে জীবন, জয়শ্রী জীবন! [১৩]

আবুল হাসানের কবিতায় দুঃখময়তার উপলব্ধি প্রথমাবধিই লক্ষ্য করা যায়। *'রাজা যায় রাজা আসে'* কাব্যের আত্মগত দুঃখবোধ *'যে তুমি হরণ-করো'*-তে এসে স্বদেশের দুঃখের সঙ্গে মিশে নতুন মাত্রায় হয়েছে বিস্তৃত। সমস্ত ক্ষয় আর ফলহীন বীজের দুঃখবোধ নিয়ে যে কবির যাত্রারম্ভ, অচিরেই তিনি দুঃখের সাগরে ভাসান দুঃখ-বিজয়ী সমুত্থিত সম্ভাবনার লালপদ্ম। তাই *'যে তুমি হরণ করো'* কাব্যের প্রথমেই ''দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও আমি অনাবাদী রাখবো না আর আমার ভেতর''-- এমন নীল-বিষাদের পংক্তি রচনা করেও অন্তিমে তিনি উপস্থিত হন নতুন পরিচয় নিয়ে--মানুষের দুঃখের কবি, উদিত দুঃখের কবি এবং অনাগত সম্ভাবনার কবি হিসেবে:

উদিত দুঃখের দেশ, হে কবিতা হে দুধভাত তুমি ফিরে এসো!
মানুষের লোকালয়ে ললিতলোভনকান্তি কবিদের মতো
তুমি বেঁচে থাকো
তুমি ফের ঘুরে ঘুরে ডাকো সুসময়!
... ...

উদিত দুঃখের দেশ তাই বলি হে কবিতা, দুধভাত তুমি ফিরে এসো,
সূর্য হোক শিশিরের ভোর, মাতৃস্তন হোক শিশুর শহর! [১৪]

দুঃখবোধের পাশাপাশি আবুল হাসানের কবিতায় গভীর ছায়া ফেলেছে মৃত্যুচেতনা। অসুস্থ অবস্থায় তিনি মৃত্যুর সান্নিধ্য লাভ করেছেন কিন্তু তাঁর কবিতায় মৃত্যুর পটে উঠে এসেছে মৃত্যুবিজয়ী জীবনের গান। সমালোচক যথার্থই বলেছেন-- ''আবুল হাসান অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তাঁর কবিতা অসুস্থ নয়। সমস্ত রুগ্নতাকে অতিক্রম করে হাসানের কবিতা পাঠকের কাছে সুস্থতার দিকনির্দেশ বলে প্রতিভাত হয়। চারটি গ্রন্থেই তাঁর মৃত্যু-সম্পর্কিত কবিতাসমূহে দ্বৈত অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এসব কবিতার উৎসভূমি মৃত্যু, কিন্তু লক্ষ্যস্থল জীবনবোধ। এই দ্বৈত চারিত্র্য হাসানের আশাবাদী মনস্কতার সাক্ষ্যবহন করে।''[১৫] বস্তুত, মৃত্যুচিন্তাই আবুল হাসানের কাব্যদর্শনের কেন্দ্রীয় শক্তি। কিন্তু তাঁর প্রাতিস্বিকতা এখানে যে, তিনি মৃত্যুর মহান চিন্তায় নিমগ্ন থেকে আবিষ্কার করেছেন জীবনের যথার্থ অর্থ-- জীবন ও মৃত্যু নামক দুই পরস্পর-বিপরীত সত্তাকে তিনি মিলিয়েছেন শিল্পিত স্বরগ্রামে, যেমন মেলান রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দার্শনিক প্রতীতির ছোঁয়ায় মৃত্যু-বিষয়ক কবিতা হয়ে ওঠে জীবনের পরমার্থসঙ্গীত :

মারী ও বন্যায় যার মৃত্যু হয় হোক। আমি মরি নাই-- শোনো
লেবুর কুঞ্জের শস্যে সংগৃহীত লেবুর আত্মার জিভে জিভ রেখে
শিশু যে আস্বাদ আর নারী যে গভীর স্বাদ
সংগোপন শিহরণে পায়-- আমি তাই।
... ...
আমি মরি না, মরি না কেউ কোনদিন কোনো অস্ত্রে
আমার আত্মাকে দীর্ণ মারতে পারবে না। [১৬]

পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে স্পেনের ফেদরিকো গারথিয়া লোরকার সঙ্গে আবুল হাসান উপলব্ধি করেছেন আত্মিক সম্পর্ক। ''গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর,'' ''নচিকেতা,'' ''নিঃসঙ্গতা'' প্রভৃতি কবিতা-পাঠে বোঝা যায় আবুল হাসান লোরকা দ্বারা কতটা প্রাণিত হয়েছেন। স্পেনের আন্দালুসিয়ার সেই ভবঘুরে গায়ক-বাদক 'ক্রুবাদুর' কবির সাথে আবুল হাসান উপলব্ধি করেন আত্মিক সম্পর্ক:

গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর আমিও ভবঘুরেদের প্রধান ছিলাম।
জ্যোৎস্নায় ফেরা জাগুয়ার চাঁদ দাঁতে ফালা ফালা করেছে আমারও প্রেমিক হৃদয়।
...

আমারও ভ্রমণ পিপাসা আমাকে নারীর নাভিতে ঘুরিয়ে মেরেছে
আমিও প্রেমিক ক্রুবাদুর গান স্মৃতি সমুদ্রে একা শাম্পান হয়েছি আবার [১৭]

আবুল হাসানের কবিতায় লোরকার প্রভাব–প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়–''আবুল হাসানের ''নিঃসঙ্গতা'' (*'যে তুমি হরণ করো'*) কবিতায় লোরকার কাসিদার আঙ্গিককে সম্ভবতঃ সচেতনভাবেই অনুসরণ করা হয়েছে। লোরকার *Casida De La Rosa* (গোলাপের কাসিদা). *Casida De La Mujer Tendida* (বিশ্রামরত রমণীর কাসিদা) অথবা Casida De La Palmos Oscuras (কালো কপোতের কাসিদা) আরবী কাসিদার সংহত সংক্ষিপ্ত রূপ এবং লিরিক গীতলতার হিস্পানী সংস্করণ।... ধরে নেয়া যায়, আবুল হাসান অন্য অনেকের মতোই লোরকার বিষন্ন এবং রহস্যময় উচ্চারণের, তার ছন্দোময় লিরিক–ঝংকারের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। 'নিঃসঙ্গতা' নামক কবিতার সাথে লোরকার *'গোলাপের কাসিদা'র* এতটা সাদৃশ্য শুধু কাকতালীয় ঘটনা নয়। লোরকা হাসানের কবিচেতনায় প্রোথিত অন্যতম উজ্জ্বল মায়াবী করুণ লাবণ্য পাথর ছিলেন।''[১৮]

'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে বিচিত্র ভাবের কবিতা। তবে এখানে যে নতুন মাত্রা আমরা লক্ষ্য করি, তা হলো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী কিছু কবিতা, যা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত কাব্যত্রয়ে সঙ্কলিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভেতরে ভেতরে আবুল হাসানকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, তার স্বাক্ষর আছে 'যাই' শীর্ষক একটি অসামান্য কবিতায় :

যাই, এখন তাদের শরীরে শস্যের আভা ঝরে পড়ছে যাই ...
মৃত্যু আর মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধারে যাই,
বিবর্ণ ঘাসের ঘরে ফিরে যাই, যাই
সেখানে বোনের লাশ, আমার ভাইয়ের লাশ খুঁজে নিতে হবে, আমি যাই
দেখি কারা দিকে দিকে দীর্ঘ মেঘে ঢাকা পড়ে আছে
দেখি, কোথায় সে জলাভূমি, কোথায় সে টেঞ্চ, নালা,
ইটের নদীর তলদেশে আর
কোথায় সে নীলিমার নক্ষত্রবিথীর শান্তি, সবুজ রং–এর শীত, দেখি
কোথায় কাহারা আজ এত উষ্ণ মৃত্যুতে স্থির, নির্যাতিত আলোয় স্থির...[১৯]

শব্দ–ব্যবহার এবং অলঙ্কার–সৃজনে আবুল হাসান প্রথম থেকেই প্রাতিস্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে চয়ন করা উপাদান দিয়ে গড়ে–তোলা তাঁর উপমা–উৎপ্রেক্ষা–চিত্রকল্প সহজেই আকৃষ্ট করে সচেতন পাঠককে। যেমন:

ক. কবার ডাউন ট্রেনের মতো বৃষ্টি এসে থেমেছিল
আমাদের ইস্টিশনে সারাদিন জল ডাকাতের মতো
উৎপাত শুরু কোরে দিয়েছিল তারা;
ছোটো-খাটো রাজনীতিকের মতো পাড়ায়-পাড়ায়
জুড়ে দিয়েছিল অথই শ্লোগান! [২০]

খ. হঠাৎ নিদ্রা ভেঙ্গে যেতে দেখি মধুর চাঁকের মতো অন্ধকার![২১]

গ. ধানের মতোন ঝরছে অভাবের যুবতী শরীর![২২]

ঘ. আমারও তো শান্তি আছে, কুকুরের মতো কালো তেষ্টা পায়
আমারও তো যখন তখন! [২৩]

ঙ. এত ফর্সা উঠেছে রোদ্দুর
তোমার দাঁতের মতো এত ফর্সা দিন আজ
উঠেছে শহরে [২৪]

কবিতায় শব্দ-ব্যবহার এবং অলঙ্কার-নির্মাণে আবুল হাসান ছিলেন পরম শুদ্ধতার অভিসারী। সতত নিরীক্ষায় তিনি সাজিয়ে তোলেন তাঁর কবিতার নির্মেদ শরীর। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য--''আবুল হাসানের সমসাময়িক যারা বন্ধু ও সহকবি ছিলেন তারাও জানেন অত্যন্ত সল্প-সময়ে একজন সংকলন-সম্পাদকের কাছে একটি তরতাজা প্রকাশযোগ্য কবিতা লিখে দেয়ার মতো বিরল কবিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আবুল হাসান তার প্রতিটি কবিতা নির্মাণে অবিশ্বাস্য শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন। তার কোনো কোনো কবিতার চূড়ান্ত ভাষ্য তৈরীর আগে ব্যয়িত হয়েছে একাধিক বিনিদ্র রজনী ও অসংখ্য শাদা কাগজ।'' [২৫]

আবুল হাসানের ছোটগল্প, তাঁর কবিতার মতই, আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার শিল্পকুসুম। আবুল হাসানের অধিকাংশ ছোগটল্পের বিষয়াংশ শাহরিক মধ্যবিত্ত-জীবনসংলগ্ন। যেমন কবিতায় তেমনি ছোটগল্পেও, বক্তব্য ও প্রকরণে আবুল হাসান ছিলেন ব্যতিক্রমী, জীবনার্থের প্রশ্নে প্রাতিস্বিক, উপস্থাপনা ও ভাষাশৈলীতে পরীক্ষাপ্রিয়। তাঁর অধিকাংশ গল্পই কবিতাস্নিগ্ধ, মনস্তত্ত্বধর্মী ও মনোময়। তাঁর গল্পগুলো পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, এগুলো একজন কবির রচনা। আবুল হাসানের অধিকাংশ গল্পই শিল্পরূপ পেয়েছে মগ্ন-চেতনার ভগ্নক্রম বিন্যাসে। যেমন :

ঘুমের মধ্যে তাই তার শয্যা, তার সিঁথি, তার বুক, তার 'যৌবন-কোমল' জায়গা, তার 'নিজেরও-ইচ্ছে-করেনা দেখতে'র টলটলে লজ্জা কেমন ঘাস, প্রজাপতি, নদীর ঢেউ আর নদীতে বাঁধা ছোটো ছোটো নৌকা হয়ে যায়। আর এই বিভিন্ন সম্পদ নিয়ে সে অবিকল একটা সরোবর--যার ওপর দয়ে তার আনন্দের বাতাস, তার নিরানন্দের ঘূর্ণি চাঁদের দেহকে টুকরো টুকরো করে গলিয়ে দেয়।

একদিন জ্যোৎস্নারাতে তাই-ই হয়েছিলো, কিন্তু সেদিন বুঝতে পারেনি আমিনা। ভাই বাড়ীতে ছিলনা সেদিন, ছোটো বোন পড়ার টেবিলে মাথাটা সোপর্দ কোরে দিয়ে ঘুমে মগ্ন যখোন, তখোন সে বাইরের রান্নাঘরের ওদিকে, যেখানে একটা নীলমণি লতা আর কামিনীর ঝোপ পরস্পর মেশা, তার পাশে একটা বড় ধরনের দেবদারু গাছ--সেখানে দাঁড়িয়ে অবিকল সে যখোন অতীতে নিমজ্জিত, তখোন কেন যেন মনে হলো তার তার সামনে, তার পশ্চাতে একটা রূপালী সরোবর ঢল ঢল জল নিয়ে থৈ থৈ কোরছে। আর নীলমণি লতা, কামিনী ঝোপ আর দেবদারু গাছের পাতা শ্বেত হংসের মতো পাখা ঝাপটাচ্ছে স্বপ্নভিতরের দোকান ঘরের সুগন্ধ মাখবে বলে। আমিনার দেহ থেকে ক্যামোন একটা হাল্কা ব্যর্থতা ঐ রূপোলী সরোবরে চারিয়ে যাওয়ায় তার মনে হলো, এ্যাখোন ঘরে ফিরে যাওয়া দরকর। ঘরে ফিরে এসেই দ্যাখে, ভাই; ভাইয়ের বন্ধু। তাদের চোখের আঁধার ক্যামোন চিতা বাঘের মতো জ্বলছে। [২৬]

আধুনিক মানুষের অস্তিত্বশঙ্কা, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, আত্মমগ্নতা এবং স্মৃতিমুগ্ধতা-প্রভৃতি মিলে গড়ে উঠেছে আবুল হাসানের গল্পের অবয়ব। জীবনের উপরিতল নয়, বরং তিনি উন্মোচন করেন মানুষের অন্তর্গত রক্তক্ষরণের ইতিহাস। মানুষের অন্তর্বাস্তবতার প্রতীকী-উন্মোচনে হাসানের ভাষা-রীতি বাংলাদেশের ছোটগল্প-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। অন্তর্গত রক্তক্ষরণ চিত্রণে তিনি ব্যবহার করেন কবিতাস্পর্শী ভাষা এবং এভাবে তাঁর গদ্যও অনায়াসে অঙ্গে জড়ায় কবিতার লাবণ্য। যেমন--''মনে আছে কেবল জ্যোৎস্না। মনে আছে কেবল লাল দালান। মনে আছে কেবল আমের বোলের গন্ধ। কোকিল আমাদের বিশ্ব সংসার থেকে যেনো কোথাও পালিয়ে গেছে। তুমি একদিন কোকিলের স্বর নকল কোরে শুনিয়েছিলে। অবিকল সে রকম। তখন হঠাৎ ঘরে বসন্ত এসেছিল। যদিও ছিল সেটা শীতকাল। তবুও কেন জানি বসন্ত এসে গিয়েছিল। আমি তোমার চোখের উপর চোখ রেখে বোলেছিলাম এমন কাউকে পেলে আজীবন কত কোকিল ডাকে। আর, আর কত বসন্ত আসে। [২৭]

অমাত্যদের আসা-যাওয়ার পথে পৃথক পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে কবিতায় যে জয়শ্রী-জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন আবুল হাসান, তাঁর নাটকেও উন্মোচিত হয়েছে সে-স্বপ্নেরই নবতর রূপ। অস্থির পৃথিবীতে বাস করে কবিতায় যে 'শান্তি শান্তি' বলে প্রার্থনা করেছেন আবুল হাসান, নাটকে সেই শান্তির সন্ধান পেয়েছেন তিনি-অনিঃশেষ শান্তিকামী আলোর ঝর্নাধারা নিয়ে এসেছে তাঁর কাব্যনাটক '*ওরা কয়েকজন*'। এ কাব্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীরা ব্যক্তিক কুণ্ডায়ন অতিক্রম করে শান্তি-অন্বেষায় এক সময় পরিণত হয় সামষ্টিক-সত্তায়:

নারী : ভালোবাসা মানে এই পরস্পর শান্তি আর একতাবদ্ধতা,
ভালোবাসা মানেই তো একে অপরের প্রতি সুবিশ্বাসী হওয়া
ভালোবাসা মানেই তো হৃদয়ের ইতিহাস থেকে সব
ঐতিহ্য ধারণ করা,
ভালোবাসা মানেই তো একতার উর্ধ্বে সুসহংত হওয়া
ভালোবাসা মানেই তো ক্ষণ-বিভ্রমের শেষ
এর আলোয় কোনো অবিশ্বাসী উত্তেজনা নেই
বিভ্রান্তিও নেই।

প্রেমিক : আর নেই কারো কোনো চিত্তবিকারের পরিণতি,
প্রকৃত আলোর কোন ক্ষয় নেই।
আলো অনিঃশেষ
আলে শান্তিকামী [২৮]

অপ্রকাশিত নাটক '*পরিস্থিতি*'তেও এই শান্তির প্রার্থনা-সঙ্গীত হয়েছে রূপবন্ধ। এখানেও একজন নাট্যকারের পিছনে সব সময় সক্রিয় থেকেছেন একজন রোম্যান্টিক কবি। নাটকের সমাপ্তিতে নায়কের ইতিবাচক জীবনার্থে উত্তরণ আমাদের আশ্বস্ত করে--আমরাও, নায়কের মতো, হয়ে উঠি শান্তির শ্বেত-কপোত। শব্দ-ব্যবহার, সংলাপ-নির্মিতি এবং ঘটনাংশ-বিন্যাসে, এই নাটকে, আমরা সর্বদা লক্ষ্য করি কবিতার ফুলেল লাবণ্য। যেমন :

নায়িকা : বুঝছো না কেন, আমাদের সিদ্ধান্তটা তো মাকে জানানো দরকার।

নায়ক : লিখে দাও, আমরা আগামী মাসে মফস্বলে বেড়াতে যাবো।শিকারে যাবো। শিশিরে স্নান কোরবো।...

নায়িকা : (লাজুক ভাবে) কোথায় যাবে?

নায়ক : যেখানে বকুল গাছ আছে, সেখানে—

নায়িকা : যেখানে বৃষ্টি গান শোনায়, সেখানে...

নায়ক : যেখানে শিশির...

নায়িকা : (নায়কের কথার মাঝে বোলে উঠবে) তোমার শুধু হেঁয়ালি!

নায়ক : (সেদিকে কান না দিয়ে) আমাদের কবে দেখা হয়েছিলো?

নায়িকা : যেদিন তুমি গাছের ফুল ফোঁটা দেখে আমকে দেখিয়ে দিয়েছিলে।

নায়ক : সেদিন বৃষ্টি ছিল!

নায়িকা : বৃষ্টি ছিল আমাদের শিকড়ে শিকড়ে!

নায়ক: জল দাও–

নায়িকা : (গ্লাসে পানি আনতেই নায়ক হেসে উঠবে) ধুর বোকা! 'জল দাও' একটি উন্যাসের নাম। খুব নামকরা উপন্যাস।

নায়িকা : কার?

নায়ক: লেখকের নাম মনে নেই।

নায়িকা : তুমি কি করলে শেষ পর্যন্ত?

নায়ক : (সেদিকে কান না দিয়ে) আমরা আর কবুতর শিকার কোরবোনা। কেননা ওরা যে শান্তির বৃষ্টি–ভেজা বকুল ফুল।[২৯]

সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মই কেবল নয়, আবুল হাসান রচনা করেছেন কতিপয় প্রবন্ধ, যে–সব প্রবন্ধে ধরা পড়েছে তাঁর প্রাতিস্বিক মনন ও ব্যতিক্রমী বিবেচনা–বোধের পরিচয়। সাহিত্যবিবেচনায় আবুল হাসানের সমাজ ও রাজনীতি–সচেতনতার পরিচয় সুস্পষ্ট। কবিতা বা ছোটগল্প যে বৃন্তলীন কোন কুসুম নয়, তারও যে আছে সমাজ–পটভূমি—আবুল হাসান প্রবন্ধরচনার সময় এ—সত্যটি সর্বদা স্মরণে রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের কবিতা–বিষয়ক একটি প্রবন্ধে আমরা তাঁর এই সচেতন বিশ্লেষণীশক্তির পরিচয় পাই:

> এখন প্রশ্ন, বাঙলাদেশের এইসব অন্যান্য আন্দোলিত প্রেক্ষিতের মতো বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙলা কবিতায় এই উজ্জীবন কতটা ফলপ্রসূ হতে পেরেছে? কতটা তীর্যক এবং ভিন্নধর্মী

হয়েছে তার ভাষা ব্যবহার? বাঙলাদেশের ক'জন কবি-সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন? কেউই নন। সমর সমস্যা কাটিয়ে ওঠার দীর্ঘ মানস-প্রস্তুতির আগেই সৌভাগ্যবশতঃ বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির ভয়াবহতার পরে সেই ন'মাসের ভিতরে কিছু কিছু লেখক এবং কবি শিল্পী সাহিত্যিক বাঙলাদেরশের সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। কোলকাতায় তারা সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র নামক বেতার যন্ত্রও স্থাপিত হয়েছিল। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র অনুপ্রেরণা-স্বরূপ তখোন কিছু নতুন ধরনের সংগ্রামী গান আমরা ঐ সময়ে বেতার মাধ্যমে শুনতে পেতাম। মাঝে মাঝে কিছু নতুন ধরনের সংগ্রামী কবিতাও; যাতে স্টেনগান থেকে শুরু করে মর্টারের বর্ণনা থাকতো। সেই সব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদির কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনপূর্বক ঐ ধরনের কবিতা লেখা হয়েছিল বলেই হয়তো তাতে নতুন ধরনের আবহাওয়া ও উজ্জ্বল উদ্ধারের আমেজ প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য সেই সব কবিতার রচয়িতা যেহেতু প্রতিষ্ঠিত অর্থে আগে থেকেই কোনো নামকরা কবি-সাহিত্যিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেননি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের পরে সেই সব কবিতা আমাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। আর সেই সময়ে যারা যুদ্ধকবলিত স্বদেশের বিবর্ণ সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেলেন, স্বভাবতই তাদের চোখ মুখ তাদের হৃদয় সম্পূর্ণ আতঙ্কিত তখোন। তাদের আত্মায় তখোন যুদ্ধের ক্ষমাহীন হিংস্র নৈঃশব্দ্যতা বিরাজমান। তাদের উল্লেখযোগ্য কলমের ডগায় তখোন এক ধরনের নিরাজ স্তব্ধতার ভাষা বিরাজমান। ভিতরে ভিতরে সেই সব স্থিরতার অকূল মানস-প্রবাহের তরঙ্গ এসে মুহুর্মুহু আঘাত দিচ্ছিল প্রত্যেক সচেতন কবিকেই। যে-সব কবি সাহিত্যিক ভারতে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তারা স্বভাবতঃই আমাদের এখানকার সেই ভয়াবহ স্তব্ধতার তৎকালীন নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি। সুতরাং তারা যা লিখেছেন সেটা তখোনকার সময়ের সত্যিকার প্রতিবিম্ব না হয়ে বরং অন্যরকম হয়েছে। আবার এখানেও যা লেখা হয়েছে এবং পরে যা পুস্তকাকারে অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ তা-ও যথেষ্ট পরিমাণ তীর্যক এবং শক্তিশালী হতে পারেনি। যে অর্থে তীর্যক এবং শক্তিশালী ভাষার ক্ষমতা অর্জন করেছিল একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কবিতা। বাঙলা কবিতার অন্যতম কণ্ঠস্বর শামসুর রাহমানের যুদ্ধ সময়ের রচিত কিছু কিছু কবিতা বাদ দিলে তারও কবিতা মনে হয়েছে বানিয়ে তোলা সংবাদ-ভাষ্য। ভাষার বিবর্তন হয়েছে কেবল বস্তু বর্ণনায় কিন্তু ভিতরের অন্তঃশীল সত্তাটি রয়ে গেছে একেবারে নিরিবিলি, একেবারে সরল। যা কোনো যুদ্ধ সময়ের হিংস্রতার সত্যিকার সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। সেই সময়ের বিপদগ্রস্ততার কোনো চিহ্নমাত্র কোনো ছায়ামাত্র তীব্রভাবে তার কবিতায় আমার মনে হয় আশ্রয় পায়নি। কেবল সেইসব দুর্দিনের

ভাষা সংবাদের মতো স্থান পেয়েছে তাতে--এ বৈ শিল্পক্ষমতায় আমাদের অধীত অভিজ্ঞতার শ্রদ্ধা তার কবিতা পেতে পারে না। তার এই সব কবিতার সঙ্গে সমানভাবে আমাদের তৎকালীন হিংস্র দুর্দিনের প্রখর স্তব্ধতা, সেই সব আত্মগত অপমান; সেই সব পরিস্থিতির খল ছদ্মবেশও যুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি কারণ তিনি দিনযাপন মেপে যদিও তখোন কবিতা লিখেছেন, সেটা শত হলেও সুরক্ষিত আধারের ভিতর বসে বসে লেখা। প্রত্যক্ষ অনুভূতির উদার সঞ্চয় নয়। এও হতে পারে, সেই সময়ে হয়তো তার এইসব কবিতা লেখার মানসিক প্রস্তুতি প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করেনি। কেননা তার আগেই প্রথাগতভাবে এবং অলৌকিকভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। ফলে সেই যুদ্ধের তরঙ্গ যতটুকু দুরন্ত অভিঘাতরাশি এনেছিলো কবিদের মানসিক গভীরতায়, তাতে সার্থক কবিতাপ্রতিম নির্মাণের যথাসম্ভব পলি জমে উঠতে পারেনি এবং সেই সব কবিতার শরীর শিল্পনৈপুণ্যে সৎ শব্দপ্রজ্ঞার অলঙ্কারে রয়ে গেছে অসমাপ্ত।[৩০]

এই সমাজ-সচেতনতার পরিচয় সংবাদপত্রের জন্য লেখা আবুল হাসানের উপ-সম্পাদকীয় কলামগুলিতেও বিধৃত হয়ে আছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালের সামাজিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের বিপন্নতা, মননের বিনষ্টি এবং সর্বব্যাপ্ত হতাশার পঙ্কে তিনি ফোটাতে চেয়েছেন নবচেতনার লালপদ্ম। বাইরে উদাসীন নির্লিপ্ত থাকলেও, ভিতরে ভিতরে তাঁর সচেতনতা এবং রক্তক্ষরণ সহজেই অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় বারুদের গন্ধভরা দেশে ফসলবিলাসী হাওয়ার জন্য তাঁর উদগ্র বাসনা-বহ্নি :

কারো ব্যক্তিগত গোলায় ধানের মজুত হোক, আর কেউ অনাহারে মরুক এই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে সমাজকে বাঁচাবার জন্য যারা হাতিয়ার তুলে নিয়েছেন, যারা সুষম বন্টনের সঙ্গে তাদের সচেতনতার বৈবাহিক রীতি ঘটিয়েছেন তারা আমাদের নমস্য। আমাদের সব কিছুর মূলেই তো এই ধানের আকাঙ্ক্ষা। ধান আমাদের সচেতন মূল্যবোধ। ধান আমদের 'যুদ্ধ নয় শান্তি'র শ্লোগান। ধান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাও। ধান আমদের পবিত্র টাকা। ধান আমদের শিক্ষা। ধান আমদের পোশাক পরিচ্ছদ। ধান আমাদের কলকারখানার উৎপাদন। সবকিছুর প্রতীকে এই ধানের সুষম ফলনের অপেক্ষায় যেসব চাষীর লাঙ্গলের ফাল দেশের মাটির ভিতর প্রবিষ্ট-দেশের গভীর ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের মধ্যে যার ফলা চলন্ত-সেই চাষীর সন্তান আমরা দুধে ভাতে থাকার আকাঙ্ক্ষায় আমদের চারপাশে এই প্রার্থনা সতেজ চারার মতো লাগিয়ে দিতে চাই। আমরাও দুঃখহীন ভাষায় বলে দিতে চাই—

আমরা কোনো ছলাকলা বুঝিনা। বঙ্গোপসাগরের তেলের খনির ভিতরে কত তেল ভবিষ্যতে আমরা পাব--সেই স্পেকুলেশনের ভিত্তিতে আমাদের মাথা ব্যথা না করে আমরা আমাদের নগদ জমির ধানের সত্যিকার বন্টন চাই। রাজনৈতিক ফাইলের ভিতর যে অহরহ কৃত্রিম ফাইল গড়ে উঠছে অথবা আণবিক শক্তি কমিশনের আস্তিনায় একচিলতে জমির উপর যে সবুজ বিপ্লবের আংশিক ধান ফলনের সবুজ প্রচেষ্টা প্রকাশিত--সেই সব প্রচেষ্টার বাগড়ম্বর ও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে আমাদের পেট ও প্রাণের ক্ষুধা মেটানোর ধান যা আমরা কষ্ট করেও ফলিয়ে আসছি তার সত্যিকার স্থিতি চাই।

সংবাদত্রের পৃষ্ঠায়ও তো বহুতর ধান ফলানো হয়। ট্রাক্টর চালিয়ে সবুজ বিপ্লবের ছবি ছাপিয়ে...ধানের বর্ণনাবহুল বৈশিষ্ট্য বহুতরভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায় এই বঙ্গদেশে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো মাত্রই সার, সব কৌশলে এখন সবার জানা হয়ে গেছে। সব কৃত্রিমতা মানুষ ঈশ্বরের আস্তিন থেকে খুলে পড়তে দেখেছে। এখন তাই সবার চোখ জমির দিকে--যে জমিতে সুবাতাস আসবে--যা ফসলবিলাসী হাওয়ার নাম--এবং যে জমিতে এমন ধান ফলবে, যা সেই ফসলবিলাসী হাওয়ায় দুলতেই আমাদের অজান্তে ঠোঁটের প্রান্ত থেকে বাঁকা হাসি বেরিয়ে আসবে--বেঁচে আছি।[৩১]

উপর্যুক্ত মানসপ্রবণতা, চিত্তজাগতিক চারিত্র্য, প্রাতিস্বিক সাহিত্যবোধ এবং স্বতন্ত্র জীবনবীক্ষা বাংলাদেশের সাহিত্যে কবি আবুল হাসানের বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। আবুল হাসান তাঁর অনন্য-মানসতা এবং স্বতন্ত্র জীবনভাষ্য উপস্থাপনে, সতত-সাধনায় নির্মাণ করেছেন একটি নিজস্ব প্রকরণ-শৈলী, প্রাতিস্বিক কবিভাষা এবং বিশিষ্ট অলঙ্কারসৃজন--রীতি। বিষয়ের আধুনিকতা, ব্যক্তি-বৃত্তে সমষ্টির বিন্যাস-রীতি, প্রকরণ-প্রসাধনে নিরীক্ষাধর্মিতা এবং জীবন-অন্বেষায় ইতিবাচকতাই কবি আবুল হাসানকে বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যে অবিসম্বাদিত ভাবে এনে দিয়েছে একজন মুখ্য কবির মর্যদা।

তথ্য–নির্দেশ

১. এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এ–সব তথ্য আমাকে সরবরাহ করেছেন আবুল হাসানের জননী মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ–০২.১০.১৯৯০

২. ''পাখী হয়ে যায় এই প্রাণ,'' রফিকুল ইসলাম–সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' গ্রন্থে সঙ্কলিত। দ্রষ্টব্য– 'আধুনিক কবিতা,' বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ২৮৫–৮৬

৩. খোন্দকার আশরাফ হোসেন : 'আবুল হাসান : জয়শ্রী–জীবনের সন্ত–কবি,' '''সচিত্র সন্ধানী,'' ১৯ আগষ্ট ১৯৯০, ঢাকা, পৃ. ৩৩–৩৪

৪. আবুল হাসান : ''অন্যরা যা বলে বলুক,'': *দৈনিক জনপদ*, ১০.০৬. ১৯৭৩

৫. আবুল হাসান : ''পাখী হয়ে যায় এই প্রাণ'', *'রাজা যায় রাজা আসে'*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ১৩

৬. আবুল হাসান : 'আপন ছায়া', *দৈনিক জনপদ*, ০৪.০২.১৯৭৩

৭. ''স্মৃতিকথা,'' *'রাজা যায় রাজা আসে,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৮. ''নঃসন্দেহ গন্তব্য,'' *'রাজা যায় রাজা আসে'*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৯. ''শস্যপর্ব,'' *'যে তুমি হরণ করো'*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৬৬–৬৭

১০. ''বলো তারে শান্তি শান্তি,'' ''পৃথক পালঙ্ক,' ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৯–৭০

১১. '''রাগ শয্যায় বিদেশ থেকে,'' *'পৃথক পালঙ্ক,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১২. ''ঝিনুক নীরবে সহো,'' *'পৃথক পালঙ্ক,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১৩. ''জলসত্তা;'' *'পৃথক পালঙ্ক,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৪. ''উদিত দুঃখের দেশ,'' *'যে তুমি হরণ করো,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৫. মুশাররফ করিম : ''আবুল হাসানের কবিতায় মৃত্যুচিন্তা ও জীবনবোধ,'' *দৈনিক বাংলা,* অগ্রহায়ণ ৮, ১৩৯৭

১৬ ''নচিকেতা,'' 'পৃথক পালঙ্ক,' পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০

১৭. ''গালাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর,'' *'যে তুমি হরণ করো,'* পূর্বোক্ত পৃ. ৫৮-৫৯

১৮. খোন্দকার আশরাফ হোসেনঃ ''আবুল হাসানের কবিতায় লোরকা-অনুষঙ্গ,'' *'কবি ও কবিতা,'* 'ফাল্গুন ১৩৯২, পৃ. ২৪-২৫

১৯. *'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা,'* সম্পাদক-মুহম্মদ নূরুল হুদা ও অন্যান্য), ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ . ১

২০. ''বৃষ্টিচিহ্নিত ভালোবাসা,'' *'রাজা যায় রাজা আসে,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২১. ''অনুতাপ,'' *'যে তুমি হরণ করো,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২২. ''মৃত্যু : হাসপাতালে হীরক জয়ন্তী,'' *'পৃথক পালঙ্ক,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২৩. ''রহস্য-প্রধান এলাকা,'' ''*আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা,*' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২৪. ''এক রোববারের তুমি,'' *'আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৪

২৫. ''*আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা,*'' পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য-'কথাসূত্র'।

২৬. ''সমুদ্রের ফেনা,'' *'আবুল হাসান : গল্প সংগ্রহ'* (সম্পাদকঃ তারিক সুজাত), দেশ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২২

২৭. ''তরু'', *'আবুল হাসান : গল্প সংগ্রহ,'* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২৮. *আবুল হাসান :* 'ওরা কয়েকজন', পূর্বোক্ত।

২৯. নাটকটি এখনো অপ্রকাশিত।

৩০. আবুল হাসান : ''সেই মুক্তিযুদ্ধ: সেই কবিতা,'' *দৈনিক জনপদ*, ২৪.০১.১৯৭৩

৩১. আবুল হাসান : ''ফসলবিলাসী হাওয়ার জন্য কিছু ধান চাই,'' *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ২২.০৭.১৯৭৪